# কেমিক্যাল হাব
# একটি নিঃশব্দ ঘাতক

*

প্লাটফর্ম
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

# ১ প্রেক্ষাপট

রক্তস্নাত গণহত্যার পর প্রবল গণবিক্ষোভের জেরে নন্দীগ্রাম থেকে আপাতত পিছু হটলেও রাজ্য সরকার যে কেমিক্যাল হাব গড়তে বদ্ধপরিকর সে কথা বারে বারেই জানিয়ে দিয়েছেন। সেটা কোথায় হবে তা নিয়েই শুধু সাময়িক অনিশ্চয়তা। ভিটেমাটি, জীবন-জীবিকা থেকে সাধারণ মানুষকে উৎখাত করে মুষ্টিমেয়র স্বার্থে এই পুঁজিবাদী অপউন্নয়নকে যে মানুষ কোথাও মেনে নেবে না, তা বলাই বাহুল্য। আসলে বিদেশী বিনিয়োগ আর রপ্তানীর মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ধারায় সরকার গৃহীত উন্নয়নের ছকটির প্রকৃত লক্ষ্য অবাধ লুন্ঠন। তাই এদের চাই বিনামূল্যে প্রাকৃতিক সম্পদ , সস্তা জমি। নিজ মূলধন, নিজ প্রযুক্তি, এমনকি প্রয়োজনে নিজ কাঁচামাল নিয়ে এরা আসবে, চালাবে নির্বিচার লুন্ঠন, ধ্বংস করবে প্রকৃতি, পরিবেশ, জল, বায়ু, মাটি, উৎপাদনের সমস্ত রসদ। শেষে দেশের সার্বিক অর্থনীতিকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের মুখে ফেলে চলে যাবে নির্দ্বিধায়। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষ এই ছকটি বোঝেন । তাই মুখ বুঁজে মানিয়ে নেওয়া, মেনে চলার দীর্ঘকালীন অবসাদ কাটিয়ে ক্রমশঃ আরো জোরদারভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধের সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন সবাই। সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম, ভাঙ্গর থেকে হরিপুর, ডানকুনি থেকে বারুইপুর সর্বত্রই এই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চট করে আর 'লাইফ হেল' করে দেওয়া সোজা হবে না এ কথা বুঝতে পেরে এখন নতুন করে 'হেল' বানানোর জায়গা নির্বাচনের জন্য হোমওয়ার্কে ব্যস্ত এ রাজ্যের শাসকদল। এ ব্যাপারে বুদ্ধবাবুর নেতৃত্বে রাজ্যসরকারের দক্ষতা এতখানিই প্রশ্নাতীত যে এদেশে অপউন্নয়নের আধুনিক পথিকৃৎ-এর 'মনমোহিনী' মূর্তিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে জানান দেয় যে অন্ধ্রপ্রদেশ বা গুজরাট নয় কেমিক্যাল হাব হবে এই বাংলাতেই।

কী এই কেমিক্যাল হাব যার হাত ধরে পশ্চিমবাংলার মরা গাঙে নাকি আসবে উন্নয়নের নতুন জোয়ার! এর কোনও পোশাকি সংজ্ঞা আছে কিনা জানা নেই, ব্যবহারিক সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় উৎপাদনের জন্যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল শৃঙ্খলাবদ্ধ রাসায়নিক কারখানার শিল্পতালুকই কেমিক্যাল হাব। তবে মূল বিতর্কটা সংজ্ঞা নিয়ে নয়, বিতর্কটা দূষণ, পরিবেশের ভারসাম্য, জনসাধারণের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি নিয়ে। আর অবশ্যই থাকছে এর সাথে যুক্ত প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন। যেমন ওখানে কী কী রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হবে, কাদের জন্যে হবে, তার প্রয়োজন কতটা,

উৎপন্ন দ্রব্যের মূল ভোক্তা কারা, দেশের মানুষ, নাকি আন্তর্জাতিক ক্রেতাবর্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার যদি দেশের মানুষের জন্যে হয়, তাহলে প্রশ্ন - আমাদের রসায়ন ব্যবহার নীতিটা কী হবে, কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী ব্যবহার করবো, বা কী কী করবো না প্রভৃতি। আসলে রাসায়নিক শিল্প আর অন্য পাঁচটা শিল্প এক নয়। এর পরিসরটা অনেক বিস্তৃত, এবং এর প্রভাবও সুদূরপ্রসারী। আর এই শিল্পের সাথে কৃষিনীতি সরাসরি যুক্ত, সেই সাথে যুক্ত পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কিত নানান প্রশ্ন। আজকের রাসায়নিক শিল্প একশ বছর আগের জায়গায় নেই। এখন সে তার পরিধি বিস্তার করেছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছা বা ছত্রাকনাশক, কৃষিবীজ প্রস্তুতকরণ, ওষুধ, প্রসাধন, বস্ত্র, নির্মাণ, কৃত্রিম পানীয়, প্লাস্টিক, গাড়ির টায়ার, সাবান, ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থ প্রস্তুতকরণে। কেমিক্যাল হাব-এ এইসব বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পগুলির উৎপাদন প্রক্রিয়া এমনভাবে শৃঙ্খলের মতো আন্তঃসম্পর্কিত হতে থাকে যা উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে মুনাফাবৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করে। এছাড়া এই ধরনের রাসায়নিক শিল্পতালুক স্থাপনে পদে পদে বিপদ। যেখানে বিরাট পরিমাণে বিপজ্জনক নানান যৌগ তৈরী হবে, সেখান থেকে নির্গত হবে অসংখ্য পদার্থ যা পরিবেশের পক্ষে, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পক্ষে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিরাট জনগোষ্ঠীর পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়াও থাকছে বিরাটাকারের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, যেমন প্রত্যক্ষ করেছে ভূপাল। এই প্রেক্ষিতে যদি উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানীই হয়ে যায় তাহলে আদৌ এই বাড়তি বিপদের ঝুঁকি আমরা নেবো কিনা সেটাও ভাবতে হবে।

শুধু রাসায়নিক শিল্প নয়, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, গুদামঘর, ট্যাঙ্কার, মেরামতি শিল্প প্রভৃতি নানা পরিষেবা ও সহায়তামূলক শিল্পও গড়ে ওঠে কেমিক্যাল হাবকে ঘিরে, যা দুটি শিল্পক্ষেত্রেই সরবরাহ ও পরিবহণ সংক্রান্ত খরচ কমিয়ে লাভের হার বাড়িয়ে তোলে। এর সঙ্গে প্রাপ্ত পরিকাঠামোমূলক সুযোগসুবিধার কথা ধরলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা। এ সমস্ত সুবিধের বন্দোবস্ত করতেই কেমিক্যাল হাবকে মধ্যমণি করে একটা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা ‘সেজ’ (স্পেশাল ইকোনমিক জোন) গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে বারবার। সমস্ত রকমের পরিষেবা কর ও রপ্তানী কর মকুব, আমদানী করে ব্যাপক ছাড়, উদার শ্রম আইনের নাম করে ন্যূনতম মজুরি তুলে দিয়ে চুক্তির ভিত্তিতে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ ইত্যাদি নজরানার ঢালাও আয়োজনে শিল্প সংস্থাগুলি যে ফুলে-ফেঁপে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। এছাড়া বহুদিনের

লড়াইয়ের বলে অর্জিত শ্রমসংক্রান্ত অধিকারগুলিও ‘সেজ’ আইনে খর্ব হতে বসায় শ্রমিকের কাঁধে মালিকের জোয়াল আরো চেপে বসছে। এক মুহূর্তও নেই জীবিকা বা জীবনের নিরাপত্তা, উপরন্তু ‘সেজ’ এলাকায় পরিবেশ সংক্রান্ত কোনো আইনই প্রযোজ্য না হওয়ায় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের যে ভয়াবহ ক্ষতি হতে চলেছে তার পরিণামও হবে সুদূরপ্রসারী। এমনিতেই রাসায়নিক শিল্পে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থসমূহ একাধারে যেমন পরিবেশের স্বাভাবিক জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলিকে বিঘ্নিত করার মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট করে তেমনি অন্যদিকে সরাসরিভাবেও মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে এদের প্রভাব হতে পারে মারাত্মক বিষময়। এই অবস্থায় পরিবেশ আইনে বিন্দুমাত্র ঢিলেমিই যে পরিবেশ সঙ্কটকে তীব্রতর করে তুলবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ‘সেজ’ এর রক্ষাকবচে ঢাকা কেমিক্যাল হাবের প্রস্তাবনা তাই নতুন করে শিরঃপীড়ার কারণ হতে চলেছে। এই প্রেক্ষিতে মনে রাখা দরকার আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনার কথা। সেটা ‘সেজ’ এলাকা ছিলো না, দেশের সমস্ত আইনই সেখানে প্রযোজ্য ছিল। তবুও কিন্তু ঐ দুর্ঘটনায় অভিযুক্ত ইউনিয়ান কার্বাইডকে বাগে আনা যায় নি। সেখানে ‘সেজ’ এলাকায় যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে কি হবে তা আঁচ করা খুবই সহজ।

আধুনিক প্রযুক্তি ও পুঁজিনিবিড় এইসব শিল্পে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা খুবই সীমিত। ১৮ই মে, ২০০৭ এ প্রকাশিত কেমিক্যাল হাব সংক্রান্ত নোটে রাজ্য সরকার এই হাবের সঙ্গে তুলনা করেছেন নেদারল্যান্ডের পোর্ট অফ রটারডামে গড়ে ওঠা কেমিক্যাল হাবের। সেই নোট থেকেই দেখা যাচ্ছে যে ওই অঞ্চলে বছরে ৫৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্ল্যান্টকে ঘিরে গড়ে ওঠা কেমিক্যাল হাবে চাকরি হয়েছে ৬০,০০০ লোকের, অন্যদিকে ওই নোটই বলছে যে আই ও সি যে প্ল্যান্টটি এখানে গড়বে তার পরিশোধন ক্ষমতা বছরে ১৫ মিলিয়ন মেট্রিক টনের মত হবে! তাহলে আমাদের রাজ্যের প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাবে কতো মানুষের চাকরি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় - সরকারের এই দলিল মোতাবেকই মোট কর্মসংস্থান ১৫ থেকে ১৬ হাজার ছাড়াতে পারেনা। রাজ্য সরকারের নোট অনুযায়ী এখানে মূলত পেট্রোকেমিক্যালজাত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হবে। অপরিশোধিত খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস এই শিল্পের প্রাথমিক কাঁচামাল, যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তৈল শোধনাগার বা গ্যাস ক্র্যাকার প্রমুখ শিল্পক্ষেত্রগুলি। এমন রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন অঞ্চলের মূল সমস্যা হলো বিষাক্ত

বর্জ্য যা তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক বর্জ্য থেকে কোন অংশেই কম বিপজ্জনক নয়। যে কোন বিক্রিয়াতেই প্রায় কিছু না কিছু অযাচিত দ্রব্য উৎপাদিত হয়, যেটা আর ব্যবহার করা যায় না। ইংরেজী পরিভাষায় যাকে বলে আনইনটেনডেড বাই প্রোডাক্ট। যেমন ডাইঅক্সিন, ফুরান ইত্যাদি মারাত্মক বিষাক্ত যৌগ। এছাড়া বাতাসে নির্গত হয় নানান দূষণ সৃষ্টিকারী গ্যাস। বর্জ্যের মধ্যে থাকে পারদ, আর্সেনিক সহ নানান ধাতব ভারী উপাদান। এগুলি যাবে কোথায়? বিষাক্ত বর্জ্যের পরিমাণ কমানো বা তাকে নিয়ন্ত্রণে আনাটা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। এই বাড়তি ব্যয়ভার কে গ্রহণ করবে? সমস্ত কারখানা এই বর্জ্য নির্বিচারে ঢেলে দেয় পার্শ্ববর্তী নদী, খাল বা সমুদ্রে। অনেকটা বিষ কালো ধোঁয়া হয়ে মেশে বাতাসে। স্থানীয় বায়ুমন্ডলে তৈরী করে একটা ভারী পর্দার আস্তরণ, বাতাসে জড়ো হয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য কণা যা মানুষের ফুসফুস ঝাঁঝরা করে দেয়। ভারী মৌলগুলো ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে, মাটির নীচে, স্থানীয় জলাশয়ে। ধীরে ধীরে নদী, সমুদ্র, খাল বিল, জঙ্গল গাছপালা সমস্ত অঞ্চল বিষাক্ত হয়ে ওঠে। তীব্র বিষ মাটি চুঁইয়ে চলে যায় ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূতলে, বিষাক্ত হয় পানীয় জল, সেচের মাধ্যমে আক্রান্ত হয় কৃষিক্ষেত্র, সেখান থেকে ফসল, খাদ্যশস্য, শেষ পর্যন্ত যা প্রবেশ করে প্রাণীদেহে, দেখা দেয় নানা দুরারোগ্য ব্যাধি। সে এক ভয়ানক পরিণতি। দেখা যায় শেষে ঐ অঞ্চলটাই আর বাসযোগ্য থাকে না, এলাকা ছেড়ে কারখানা গুটিয়ে নিয়ে বড়ো বড়ো কোম্পানীও সরে যায় অন্যত্র। পৃথিবীতে এমন অনেক উদাহরণ আছে। কাজেই, 'সেজ' গঠন করে একটি অঞ্চলে রাসায়নিক শিল্পতালুক স্থাপন আসলে সেই অঞ্চলটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ারই সামিল।

# ২ রাসায়নিক শিল্পে বিশ্বের অভিজ্ঞতা

কেমিক্যাল হাব, কথাটা যতোই গালভরা শোনাক না কেন এটা সেই নতুন বোতলে পুরানো মদ। পৃথিবীতে এমন বহু জায়গায় নানান নামে এই ধরনের শিল্পতালুক গড়ে উঠেছে, রসায়ন শিল্প উৎপাদক অঞ্চলের সেই অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। একটা গোটা এলাকা জুড়ে একাধিক কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য যে কী ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাতে পারে তার জ্বলন্ত নিদর্শন ব্রাজিলের রসায়ন শিল্প নগরী ক্যুবাটাও। সত্তরের দশকে উচ্চ হারে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নামে যেখানে বিনিয়োগকারীদের

ডেকে আনা হয়েছিলো নির্বিচারে। বিদেশী বিনিয়োগের জোয়ারে সেখানে গড়ে উঠেছিলো এই শিল্প নগরী - ‘দ্য কেমিক্যাল ক্যাপিট্যাল অব ব্রাজিল’। পাশেই বহমান নদী, অদূরেই ল্যাটিন আমেরিকার সর্ব বৃহৎ বন্দর সান্টোস - জলপথ, স্থলপথে অভূতপূর্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা, আর তার সাথে যুক্ত হয়েছিলো বাণিজ্যবান্ধব অনিয়ন্ত্রিত শিল্পনীতি, সস্তা শ্রম, অবাধ কর ছাড়, নাম মাত্র মূল্যে জমি। সব মিলিয়ে বলা যায় ক্যুবাটাও হয়ে উঠেছিলো লুন্ঠনের অবাধভূমি। পৃথিবীতে অন্য কোনও দেশ তখন এতো ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলো না, কাজেই সর্বোচ্চ মুনাফার আশ্বাস পেয়ে ব্রাজিল হয়ে উঠেছিলো বিনিয়োগকারীদের আদর্শ গন্তব্যস্থল। অনেকটাই আজকের পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের মতন।

## ২.১ ব্রাজিলের মৃত্যু উপত্যকা

পরিকল্পনাহীন বিশৃঙ্খল বিনিয়োগ, বল্গাহীন বাণিজ্য আর অবাধ ছাড়ের রপ্তানী নির্ভর অর্থনীতির যে কী ভয়ানক পরিণতি হতে পারে ক্যুবাটাও তার অন্যতম উদাহরণ। মাত্র এক দশকের মধ্যেই সেই শহর পরিণত হয়েছিলো মৃত্য উপত্যকায়। যে কারণে ক্যুবাটাওকে বলাই হয় ‘দি ভ্যালি অফ ডেথ’। যেখানে ধ্বংস হয়ে গেছে পাহাড় জোড়া ঘন আটলান্টিক বনাঞ্চল। সজীব শান্ত নদী ক্রমে পরিণত হয়েছে মৃত একটা জলাধারে। নদী গর্ভে কোন প্রাণ নেই, যার বুকে এখন শুধুই বিষাক্ত জল আর কিছু জলজ উদ্ভিদ। শহরের সর্বাঙ্গে বিষ। বিষাক্ত বাতাস, বিষাক্ত মাটি, জমি, জঙ্গল। ক্যুবাটাও এ তখন ভূমিষ্ঠ হচ্ছে মস্তিষ্ক বিহীন মানব শিশু। কেউ কেউ জীবিত থাকলেও জন্মাচ্ছে বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে। ভারী বাতাস, অক্সিজেনের অস্বাভাবিক ঘাটতি, বুক ভরে শ্বাস নেবার জো নেই। দিনের আকাশ অন্ধকার। চারিদিকে শুধুই ব্যাধি। এলাকার বেশির ভাগ মানুষ আক্রান্ত যক্ষা, ক্যান্সার, হাঁপানি, ফুসফুসের সমস্যা সহ নানাবিধ রোগে। পাহাড়ে ঘন বনাঞ্চলের জায়গা নিয়েছে রাসায়নের ঝাঁঝালো ধোয়ায় পাতা খসে পরা হার জিরজিরে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কিছু গাছ গাছালি। মাঝে মাঝেই নেমে আসছে ধস, দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে মানুষ। এর সাথে ঘন ঘন অ্যাসিড বৃষ্টি। সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিক বিপর্যয়। ক্যুবাটাওর পরিস্থিতি একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে যায় ১৯৮৫ সালে। যে বছর জানুয়ারী মাসে দুদিনের ১৫ ইঞ্চি টানা বর্ষণে পাহাড় থেকে শয়ে শয়ে ধস আছড়ে পড়তে থাকে ক্যুবাটাও উপত্যকায়। ভিলা প্যারিসির অ্যামোনিয়ার বিরাট

পাইপ লাইন ভেঙ্গে মুহূর্তে বেরিয়ে আসে মেঘের মতন ঘন গাঢ় ঝাঁঝালো ধোঁয়া। এই দুর্ঘটনায় বহু মানুষ আহত হন, অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকেই। প্রথমে সরকার অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গোটা অঞ্চলটা জনশূন্য করে দিতে বাধ্য হয় প্রশাসন। সাওপাওলোর গভর্নর সরকারী ভাবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। যা ছিলো অসম্ভব। তাই কুড়ি বছরেরও বেশি সময় বহু সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগেও দূষণের মাত্রা কমিয়ে এনে সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত করা যায়নি ক্যুবাটাওকে।

## ২.২ জাপান : মিনামাটা রোগ

এবার চোখ ফেরানো যাক এশিয়াতে। জাপানে কাইয়ুশুর পশ্চিমে সমুদ্র উপকূলের একটা ছোট্ট গ্রাম মিনামাটা। গত শতকের একেবারে গোড়ায় সেখানে গড়ে উঠেছিলো নিপ্পন কেসসো কোম্পানী নামক কার্বাইড কারখানা। কিন্তু শুধুমাত্র কার্বাইড উৎপন্ন করে যথেষ্ট মুনাফা হচ্ছিলো না ওদের। ধীরে ধীরে কার্বাইড থেকে প্রথমে নিপ্পন কেসসো প্রস্তুত করতে শুরু করে ক্যালসিয়াম সালফাইড এবং পরবর্তীকালে অ্যামোনিয়াম সালফেট সমৃদ্ধ রাসায়নিক সার। ইতিমধ্যে মিৎসুবিসিও তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে সামিল হয়েছে। ১৯৩০ সাল থেকে পারদের যৌগ ব্যবহার করে ওরা অ্যাসিটিলিন প্রস্তুত করার প্রযুক্তি আয়ত্ত করে। তৈরী করতে শুরু করে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটোন, বিউটানল সহ নানান জৈব দ্রব্য। এই সূত্রে অ্যাসিটিলিন কেমিস্ট্রিতে ওরা নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে ফেলে। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও। কোরিয়া সহ নানান দেশে নিপ্পন কেসসোর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নিপ্পন কেসসো কোম্পানীর এই অগ্রগতির হাত ধরে ইতিমধ্যে মিনামাটার চেহারাও বদলে গেছে অনেক। প্রথমে গ্রাম থেকে শহর, তারপর পুরোদস্তুর শিল্প নগরী হিসেবে মিনামাটার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। গড়ে উঠেছে প্রচুর রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ তো গেল অগ্রগতির একটা দিক, বাইরের ছবি। আপাত বৈভবের আড়ালে অন্যদিকে ঢাকা পরে গেছে অনেক না বলা কাহিনী, অনেক হারানো জীবন, সংসার পরিজন, তাদের জীবিকা, জীবনচর্যা। নিঃশব্দে লোকচোখের আড়ালে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে গেছে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, কৃষক ও কৃষি। রসায়ন শিল্পের করাল গ্রাস গিলে নিয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার যাবতীয় রসদ। কারখানাজাত অনিয়ন্ত্রিত বর্জ্য বিষাক্ত করেছে সমুদ্রের জল, সেখান থেকে দূষিত

হয়েছে জলজ উদ্ভিদ, সামুদ্রিক প্রাণী, মাছ। বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান প্রবেশ করেছে খাদ্য শৃঙ্খলে, সেখান থেকে অন্যান্য প্রাণীকূল হয়ে শেষ পর্যন্ত যা প্রবেশ করেছে মানুষের শরীরে। একই ভাবে দূষিত হয়েছে স্থানীয় মাটি, বায়ু, জল, জঙ্গল। সব মিলিয়ে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি যা নিয়ে কারো কোনও মাথা ব্যথা দেখা যায়নি, না কোম্পানীর, না সরকারের। ফলত অব্যাহত থাকে দূষণ, আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে দ্রুত।

অবস্থাটা ভয়াবহ হয়ে ওঠে ১৯৫৬ সাল নাগাদ। একদিন একটা অদ্ভুত উপসর্গ নিয়ে মিনামাটার হাসপাতালে ভর্তি হন চারজন রোগী। সংখ্যাটা ক্রমে বাড়তে থাকে। মাঝে মাঝেই তারা মানসিক বিকার গ্রস্ত হয়ে পড়ছেন, শুরু হচ্ছে খিঁচুনি, অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন, কোমায় চলে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত মারা যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে এলাকায় মহামারীর আকার নেয় এই অজানা রোগ। যেহেতু রোগটাই না জানা, কোন চিকিৎসাও সম্ভব ছিলোনা। অতএব মৃত্যুই অনিবার্য। ক্রমে জানা গেল এরা সবাই সমুদ্রে মাছ ধরেন এবং নিয়মিত সেই মাছ ভক্ষণ করেন। স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসক হরোসুয়াই প্রথম সন্দেহের তীর নিক্ষেপ করেন সমুদ্রের দিকে। কিছুদিনের মধ্যে ঐ বছরেই কুমামোতো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক আবিষ্কার করেন এই মারাত্মক ব্যাধির উৎস সমুদ্রের জলে নির্গত বর্জ্যে উপস্থিত মাত্রাতিরিক্ত পারদ। এ নিয়ে জাতীয় স্তরে রীতি মতন হইচই পড়ে যায়। কিন্তু কেসসো এই অভিযোগ অস্বীকার করে উৎপাদন অব্যাহত রাখে। সরকারকেও নিজেদের পাশে পেতে তাদের কোন রকম বেগ পেতে হয়নি। পরিবেশকে বিষমুক্ত করা দূরে থাক, উল্টে রিপোর্টটি-ই মুখোমুখি হয় তীব্র সরকারী সমালোচনার। কেসসোর বিরুদ্ধে স্থানীয় মৎসজীবীদের বিক্ষোভের উপরে নেমে আসে রাষ্ট্রীয় দমন পীড়ন। অন্যদিকে দলে দলে বিড়াল বিকার গ্রস্ত হয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে আত্মহত্যা করতে শুরু করে। আকাশ থেকে খসে খসে পড়তে শুরু করে আক্রান্ত পাখি। বাস্তুতন্ত্রে ঘনীভূত হয় সার্বিক বিপর্যয়। এলাকায় জনগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশে দেখা দেয় অঙ্গ বিকৃতি সহ নানাবিধ রোগ। তখন মানুষের মুখ বন্ধ করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে নিপ্পন কেসসো, আক্রান্ত মানুষের হাতে তারা গুঁজে দিতে শুরু করেন নগদ অর্থ। সরকার ছিলো এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। তারা কিন্তু কোন রকম ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেননি। অন্যদিকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত চল্লিশ হাজারেরও বেশী মানুষ মুখ চেয়ে বসে ছিলেন ক্ষতিপূরণের আশায়। একদিকে ক্ষতিপূরণও নেই অন্যদিকে উৎপাদন থামেনি,

বন্ধ হয়নি প্রাকৃতিক অনাচার। কেসসোর উপর জারী হয়নি কোনও নিয়ন্ত্রণের ফরমান, শুধু স্থানীয় মৎসজীবীদের উপর আরোপিত হল নিষেধাজ্ঞা। তারা সমুদ্রে মাছ ধরতে পারেন, কিন্তু সেই মাছ বা অন্য সামুদ্রিক জীব তারা ভক্ষণ করতে পারবেন না। এদিকে তো খবরটা চাউড় হয়ে গেছে। তাই এই এলাকার মাছ কেউ কিনছেন না। স্বাভাবিক ভাবেই এই গোটা অঞ্চলের স্থানীয় মৎস্যজীবীদের উপর নেমে আসে বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয়। ইতিমধ্যে কেসসো বর্জ্য ঢালতে শুরু করে পার্শ্ববর্তী মিনামাটা নদীতে, নদীর জলে বেয়ে এবার দূষণ ছড়িয়ে পড়ে অন্য শহরেও, অন্যত্রও আবির্ভূত হয় মিনামাটা রোগ। মারা যেতে থাকেন অসংখ্য মানুষ, আর যেহেতু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এই রোগের অন্য কোন প্রতিকার নেই, সেহেতু মিনামাটা রোগের পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। আশ্চর্য হলেও নিপ্পন কেসসো ওদের বর্জ্যজাত দূষণই যে এই মহামারীর কারণ তা কোনদিনই স্বীকার করেনি, ফলে আক্রান্ত মানুষ ক্ষতিপূরণ পায়নি আজ পর্যন্ত।

# ৩ শিল্প সংস্থাগুলির কলঙ্কিত ইতিহাস

বিশ্বজোড়া রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে মুষ্টিমেয় বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা - বি এ এস এফ, দ্যুঁপ, ডাউ, মনসান্টো, শেল, মিৎসুবিসি ইত্যাদি। একদিকে এরা গোটা বিশ্বের পরিবেশ যেমন দূষিত করছে, অন্যদিকে নানা ভাবে অনেক ক্ষেত্রেই সমাজকে অতিরিক্ত মাত্রায় রাসায়নিক শিল্প নির্ভর করে তুলছেন। শোনা যাচ্ছে ডাউ কেমিক্যাল কোম্পানী তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে আমাদের রাজ্যের প্রস্তাবিত কেমিক্যাল হাবে আসতে আগ্রহী। গত কয়েক শতাব্দী ধরে এই ডাউ বিশ্বের পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য বিপন্ন করে তুলেছে। যুদ্ধ, খাদ্য, কৃষিক্ষেত্র থেকে উৎপাদন অঞ্চল, সর্বত্র। মিশিগানের মিডল্যান্ডের কথাই ধরা যাক না, যেখানে ডাউ অন্যতম বৃহৎ কারখানা টিট্টাবাওয়াসি নদীর জল, এমন কি তার ভূতলকে বিষাক্ত করে তুলেছে। স্থানীয় মানুষ এ নিয়ে আন্দোলন করেন। এলাকার মানুষের ক্যান্সার সহ নানাবিধ রোগের আধিক্যর কারণ হিসেবে ডাউ কে দায়ী করে মামলা করেছেন। বিষাক্ত ডাইঅক্সিনের মাত্রা ওখানে অস্বাভাবিক রকমের বেশী যেখান থেকে জন্ম নিতে পারে শুধু ক্যান্সার নয়, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, জন্ম বিকৃতি, চর্মরোগ সহ নানাবিধ জটিল ব্যাধি। মিশিগান ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টাল কোয়ালিটির বুলেটিন থেকেই এ তথ্য জানা

যাচ্ছে।

ইউনিয়ন কার্বাইডকে অধিগ্রহণ করার সুবাদে এই কোম্পানীটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাসায়নিক শিল্প সংস্থা হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ইউনিয়ন কার্বাইড আমাদের দেশে বেশ পরিচিত একটি নাম। ১৯৮৪ সালে ভূপালে এদের কারখানায় ভয়াবহ গ্যাস দুর্ঘটনার কথা আমরা নিশ্চয়ই কেউ ভুলে যাই নি। প্রায়শঃই মানব ইতিহাসের জঘন্যতম শিল্প দুর্ঘটনা হিসেবে একে অভিহিত করা হয়। দুর্ঘটনাস্থল পরিষ্কার ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণের দায় বরাবরই এড়িয়ে গেছে ইউনিয়ন কার্বাইড। দায় অস্বীকারের সেই ধারা আজও টেনে নিয়ে চলেছে ডাউ। তাদের হয়ে ওকালতি করতে এবারে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র সিঙ্গুরখ্যাত টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার শ্রীযুক্ত রতন টাটা মহাশয়। ভূপাল কান্ডের দায় দায়িত্ব থেকে ডাউকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দেওয়া হোক এই মর্মে তিনি ডাউ-এর চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অ্যান্ড্রু লিভেরিসের হয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াকে। তথ্য জানার অধিকার আইনের সুবাদে এ খবর আর গোপন নেই।

ডাউ-এর কুখ্যাতি আরও প্রাচীন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মনসান্টোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ‘নাপাম’ বোমার রসদ যুগিয়েছিল ডাউই, যোগান দিয়েছিল বনাঞ্চল ধ্বংস করার উপকরণ ‘এজেন্ট অরেঞ্জ’ও। 2,4-D এবং 2,4,5-T নামের দুটি ডাইঅক্সিন যুক্ত রাসায়নিকের সমপরিমাণ মিশ্রণে তৈরী করা হয়েছিলো এই এজেন্ট অরেঞ্জ। ডাইঅক্সিন-এর প্রভাবে লিভার ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, দীর্ঘস্থায়ী ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, গর্ভপাত, শিশুর অকাল জন্ম, অঙ্গ বিকৃতি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়া গাছের সবুজ অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বাতাসে অক্সিজেনের ঘাট্‌তি দেখা দেয়। আমেরিকান মিলিটারি ভিয়েতনামে প্রায় ২১ লক্ষ গ্যালন এজেন্ট অরেঞ্জ ব্যবহার করেছিলো। এর ফলে প্রায় ৩,১৮১ টি গ্রামে ছড়িয়ে যাওয়া বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রভাবে মৃত্যু হয়েছিলো চার লক্ষ ভিয়েতনামবাসীর। আক্রান্ত অঞ্চলের খাদ্যশৃঙ্খলে ডাইঅক্সিনের প্রভাব আজও বিদ্যমান। ফলস্বরূপ ভিয়েতনামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশুই জন্মাবধি বিকলাঙ্গ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মার্কিন সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশও ‘এজেন্ট অরেঞ্জের’ বিষে আক্রান্ত হয়।

অন্যদিকে 'নাপাম' বোমার বিস্ফোরণেও মৃত্যু হয় সহস্রাধিক সাধারণ নাগরিকের। নাপাম বোমা, যা আসলে ন্যাপথেনিক ও পামিটিক নামক দুটি অ্যাসিডের সংমিশ্রণে তৈরী পাউডার, গ্যাসোলিনের সঙ্গে মেশালে একটা ঘন চটচটে বাদামী রঙের জেলিতে পরিণত হয়। এটা গ্যাসোলিনের মত দ্রুত না জ্বললেও দাহ্য পদার্থ হিসেবে গ্যাসোলিনের থেকেও অনেক বেশি কার্যকরী। শুধুমাত্র বোমায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই ১৯৪২-৪৩ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুইস এস ফিশারের নেতৃত্বে একদল রসায়নবিদ তৈরী করেছিলেন নাপাম। বোমা হিসেবে 'নাপাম' ব্যবহারের মূল কারণ হ'ল এতে অত্যন্ত কম খরচে শত্রুপক্ষের প্রচুর ক্ষতিসাধন করা যায়। একটা ১০০ গ্যালনের 'নাপাম' তৈরী করতে প্রায় চল্লিশ ডলারের মত খরচ পড়ে এবং যার একটা বিস্ফোরণ ২,৫০০ বর্গ মিটারের মত জায়গা পুড়িয়ে দিতে পারে। এছাড়া একটা ট্যাঙ্কের ৫০ ফুটের কাছাকাছি আঘাত করলে ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে যায়। সুড়ঙ্গ কিংবা গুহার ভিতরের শত্রুর মোকাবিলায় 'নাপাম' অত্যন্ত কার্যকরী। জেলির মত চটচটে হওয়ায় কোনো কিছুতে একবার লেগে গেলে সহজে আর একে ছাড়ানো যায় না। ত্বকে লেগে গেলে স্নায়ুতন্ত্র পুড়ে যায়। বিস্ফোরণস্হলের কাছাকাছি বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ এতটাই (২০ শতাংশ, যেখানে ০.৪ শতাংশই মারাত্বক) বেড়ে যায় যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, রক্তচাপ দ্রুত কমতে থাকে এবং অল্প সময় পরেই আক্রান্ত লোকজন মারা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯৪৪ সালের ২৩শে জুলাই মিত্রশক্তিই জাপানের তিনিয়ান দ্বীপে প্রথম নাপাম ফেলেছিলো। কেবল টোকিয়োতেই ১৯৪৫ সালের ৯ই ও ১০ই মার্চ পড়েছিলো ১,৫০০ টনেরও বেশী নাপাম বোমা। জাপানের ৪০ শতাংশ জমিই এর আঘাতে পুড়ে গিয়েছিলো। আর কোরিয়ার যুদ্ধের সময় আমেরিকা প্রতিদিন গড়ে ২,৫০,০০০ পাউন্ড করে নাপাম ফেলত। ১৯৫১ সালের ২০শে জানুয়ারী আমেরিকার বায়ু সেনা দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংচুন অঞ্চলের কাছাকাছি একটা গুহায় নাপাম ফেলায় সেখানে আশ্রিত প্রায় তিনশো সাধারণ মানুষ ঝলসে মারা যান। ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে ৪ লক্ষ টনের মত নাপাম-বি নামের একটি বোমা ব্যাবহার করা হয়েছিলো। এক্ষেত্রে ন্যাপথেনিক ও পামিটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে পলিস্টাইরিন ও বেঞ্জিন মেশানো হয়েছিলো গ্যাসোলিনের সঙ্গে যার ফলে মিশ্রণটি কঠিণ অবস্থায় পরিণত হতো। এর ফলে আরো নিয়ন্ত্রিতভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভবপর হয়েছিলো। সেদিনের ওই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলো এ বাংলার মানুষও, হাজারো কণ্ঠে

ধ্বনিত হয়েছিলো স্লোগান 'তোমার নাম আমার নাম, ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম'। যুদ্ধে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার নতুন কিছু নয়, সত্যি বলতে সমস্ত ছোটবড় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাসায়নিক উপাদান প্রস্তুতকারক সংস্থারই এমন ইতিহাস আছে। আর যেহেতু যুদ্ধের হাত ধরেই এই শিল্পের বিকাশ সেহেতু এটা স্বাভাবিকও।

যুদ্ধের হাত ধরে বিকাশ হলেও আজ রাসায়নিক শিল্প তার সমস্ত রকম বিষক্রিয়া সমেত আমাদের চারপাশের জগৎকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে সহজে এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল হবে। যেমন, প্রসাধন শিল্পটাকেও ছোট করে দেখা যাবে না, একে ঘিরে কোটি কোটি ডলারের বাণিজ্য হয়ে থাকে। খবরের কাগজে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন আর উন্নত দেশের শপিং মলগুলোতে গেলেই এর বহর বোঝা যায়, বুদ্ধবাবুর দৌলতে কলকাতাতেও এখন তার আঁচ নিশ্চিত ভাবেই পাচ্ছি আমরা। প্রসাধন শিল্পের পাশাপাশি গড়ে ওঠা 'অনুসারী' শিল্পের কথা না হয় নাই বা তুললাম। শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই এই ডাউ ব্রেস্ট ইমপ্লান্টের জন্যে সিলিকোনের ব্যবহার চালু করেছিলো, তাকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করেছিল, যা প্রথম পর্বেই ব্যবহার করে জাপানের যৌনকর্মীরা। ব্রেস্ট ক্যান্সার সৃষ্টির সঙ্গে এর যোগাযোগ প্রমাণিত হবার ফলে পরবর্তীকালে এ নিয়ে মার্কিন দেশে মামলা হয়, বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হয় ডাউকে। বিষাক্ত কেমিক্যালকে নিরাপদ ঘোষণা করার এটাই একমাত্র ঘটনা নয়। জেনে শুনে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো এটা করে থাকে, এটা বিভিন্ন মামলায় প্রমাণিত হয়েছে। 'ডর্সব্যান' নামে ক্লোরোপাইরিফোস গ্রুপের একটি কীটনাশক বাজারে এনেছিলো ডাউ কেমিক্যালস। লনে ব্যবহারের জন্যে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই কীটনাশকটি। জেনেশুনে গবেষণালব্ধ তথ্য গোপন করে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক এই ডর্সব্যানকে তারা 'নিরাপদ' ঘোষণা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ বহু নাগরিক এ নিয়ে মামলা করায় কোম্পানীকে ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার জরিমানা দিতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গেরস্থালির ব্যবহারের জন্যে ডর্সব্যান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

কেবল ডাউ নয়, বাণিজ্যিকভাবে রাসায়নিক প্রস্তুতকারী অন্যান্য বৃহৎ সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধেও বিপজ্জনক রাসায়নিক পণ্যগুলিকে নিরাপদ ঘোষণা করার অভিযোগ বারে বারে উঠেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ কেমিক্যাল কোম্পানী দ্যুঁপর কথাই ধরা যাক। ওদের প্রোডাক্ট টেফলন সংক্রান্ত মামলা মার্কিন দেশে এখন প্রায় সর্বজনবিদিত। এর অন্যতম উপাদান পারফ্লুওরোঅকটেন সালফোনেট মানবদেহে শোষিত হতে পারে, সেখান থেকে ক্যান্সার

সহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধি জন্ম নিতে পারে এ তথ্য কুড়ি বছরেরও বেশি গোপন রাখার অভিযোগ ওঠে। টেফলন মামলায় দ্যুঁপকে দশ লক্ষের বেশী মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এছাড়া ওয়াশিংটনে দ্যুঁপর কারখানা সন্নিহিত অঞ্চলেও পরিবেশ দূষণেরও নানা অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন টেফলনে ব্যবহৃত সি ৮ নামক ভয়ঙ্কর দ্রব্যদি স্থানীয় ট্যাপের জলের মাধ্যমে এলাকায় মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের রক্ত পরীক্ষা করে এ তথ্য জানা গেছে। এদের অন্যতম ছত্রাকনাশক বেনলেট ব্যাপক মাত্রায় ফসল নষ্ট করে দেয়, যার মধ্যে আছে টমেটো, ফার্ণ, অর্কিড ইত্যাদি নানাবিধ ফলন। যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপিনস, কোস্টারিকা, থাইল্যান্ড সহ বহু দেশেই এটা পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তথ্য গোপন করে পণ্যটিকে বাজারে আনা হয়। অথচ ১৯৯২ সালে দ্যুঁপ নিজে এর গুণাগুণ বিচার করার জন্যে কোস্টারিকায় গবেষণা চালায়। কিন্তু ততদিনে জমে ওঠা মামলা আর ক্ষতিপূরণের বহর দেখে কোম্পানী পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত যাবতীয় নথি নষ্ট করে ফেলে। এ নিয়ে ২০০১-এর কোস্টারিকার দুটি প্লান্ট নার্শারি কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে, আর সেই সুবাদেই বেরিয়ে আসে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য।

রসায়নের প্রভাব যে শুধুই প্রয়োগ ক্ষেত্রে সীমিত থাকে তা নয়, তা ছড়িয়ে পরে অন্যত্রও। যেমন দক্ষিণ ফ্লোরিডার একটি মামলায় জানা যায় ইক্যুয়াডোরে বেনলেট নামক ছত্রাকনাশকটি কৃষিক্ষেত্র থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে চিংড়ি মাছ চাষের অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করে। এর জন্যে কোম্পানীটির বিরুদ্ধে ১২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করা হয়। এছাড়া যথেষ্ঠ সাবধানতা না অবলম্বন করলে, স্বাস্থ্যের পক্ষেও বেনলেট মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে। যেমন গর্ভবতী মহিলারা এর সংস্পর্শে এলে শিশু ভ্রূণের স্বাভাবিক বিকাশ প্রতিহত হয়, যার ফলশ্রুতি জন্ম বিকৃতি। বেনলেট ছাড়াও দ্যুঁপর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে টেট্রা ইথাইল লেড (টেল) নিয়ে। এটি গ্যাসোলিনে মেশানো হত, যা শিশুদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত করে এবং এটি থেকে ক্যান্সারের সহ নানারকম অসুখ হতে পারে। সেই জন্যে ১৯৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'টেল' যুক্ত গ্যাসোলিনের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। তা সত্বেও দ্যুঁপ এটির রপ্তানী ১৯৯১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখে।

আরেকটি মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ ডাইব্রোমো ক্লোরোপ্রোপেন, সংক্ষেপে ডিবিসিপি। ১৯৭৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও ডাউ,

শেল ইত্যাদি বানিজ্যিক সংস্থাগুলি এর উৎপাদন এবং রপ্তানী অব্যাহত রাখে। এর মূল ব্যবহার আগাছা নির্মূলকারী হিসেবে, কাজেই ভূমি বা খামার মালিক শ্রম সাশ্রয় করার জন্যে এটা ব্যবহার করতে উৎসাহী হয়, অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষিমজুররা। যেমন খালিহাতে ডিবিসিপি ব্যবহার করার দরুণ কোস্টারিকার শতকরা ২০-২৫ ভাগ কৃষক প্রজনন ক্ষমতা হারিয়েছেন। অথচ ডিবিসিপির এই বিষক্রিয়া সম্পর্কে শেল ১৯৫০ সাল থেকেই অবগত ছিল। পেস্টিসাইড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক জানাচ্ছে ১৯৯৭ সালে কোর্ট বহির্ভুত সমঝোতায় এগারোটি দেশে এই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত কলা চাষে নিযুক্ত ২৬,০০০ কৃষি কর্মীকে মোট ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয় এই কোম্পানী দুটি।

এদেশে শিল্পসংস্থাগুলির দায়িত্বজ্ঞানহীনতার চূড়ান্ত নিদর্শনের সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে ভূপাল। ডিসেম্বর ৩, ১৯৮৪, রাতের অন্ধকারে ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইডের রাসায়নিক কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে মৃত্যু হয় কয়েক হাজার মানুষের। এই দুর্ঘটনা, যা দেড় লক্ষ মানুষকে করে দেয় পঙ্গু, আজ পর্যন্ত যে দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বাইশ হাজার এবং যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে, তা শুধুমাত্র ভারত কেন, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে শিল্পক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং কুখ্যাত দুর্ঘটনা। সেই রাতে প্রায় সাতাশ টনের মতো মিথাইল আইসোসায়ানেট ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস ওই কারখানাটি থেকে নির্গত হয়ে গোটা ভূপাল শহরটিকে একটা গ্যাস চেম্বারে পরিণত করেছিলো। কারখানাটির ৬ টি সুরক্ষা ব্যবস্থার একটিও কার্যকরী ছিলো না এবং ইউনিয়ন কার্বাইডের নিজস্ব তথ্যাদি থেকেই দেখা গেছে যে শধুমাত্র অর্থব্যয় কমানোর জন্য কোম্পানীটি সুরক্ষা ও যন্ত্রপাতি পরিচর্যার দিকে একদমই নজর দেয় নি।

ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ২৩ বছর পরেও প্রায় ৫০,০০০ মানুষ এখনো সেই দুর্ঘটনার ফল ভোগ করে চলেছেন। ইউনিয়ন কার্বাইডের বিষে আক্রান্ত বাবা মায়ের সন্তানও সেই বিষের কুফল বহন করছে নিজের শরীরে। 1, 3, 5 ট্রাইক্লোরোবেঞ্জিন, ডাইক্লোরোমিথেন, ক্লোরোফর্ম, সীসা, পারদের মতো বিষাক্ত পদার্থ আজও মেলে ভূপালের ওই কারখানার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মায়েদের স্তন্যদুগ্ধে। ২০০১ সালে ডাউ কেমিক্যালস ইউনিয়ন কার্বাইডকে কিনে নেয়, কিন্তু তা সত্বেও ডাউ ভূপালের দুর্ঘটনাটির দায় নিতে অস্বীকার করে। বর্তমানে ডাউ দুর্ঘটনাগ্রস্ত অঞ্চলটিকে পরিষ্কার করা, ওখানকার পানীয় জল পরিশোধন করা, দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া, চিকিৎসার বন্দোবস্ত

করা, বিষ ধোঁয়ায় আক্রান্ত এবং ওই দুর্ঘটনার পরও জীবিত মানুষদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা নজর রাখা, আক্রান্ত মানুষদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া, ভারতীয় আইনব্যবস্থার সম্মুখীন হওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজেই অস্বীকৃত হয়েছে। অজস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে মুনাফা লোটা ডাউ-এর বিরোধিতা করা তাই আদর্শগত কারণেই উচিৎ নয় কি?

# ৪ দূষণ, জনস্বাস্থ্য এবং নয়া-সাম্রাজ্যবাদ

এ কথা বলাই বাহুল্য যে রাসায়নিক শিল্প এবং দূষণ আজ প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে তীব্র পরিবেশ আন্দোলনের চাপে বিভিন্ন রাষ্ট্র একক এবং সম্মিলিত ভাবে এই নিয়ে নানা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে। ইতিমধ্যেই পৃথিবীকে বিষমুক্ত করার জন্যে ২০০১ সালে স্টকহোম কনভেনশন বারোটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যকে ‘ডার্টি ডজন’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইদানিং এই যৌগ গুলোর সাথে যুক্ত হচ্ছে আরও অনেক দ্রব্য। সেই তালিকায় যেমন আছে ‘ডাইঅক্সিন’, ‘ফুরানের’ মতন অবাঞ্ছিত বিষাক্ত বর্জ্য, তেমন আছে ‘ডিডিটি’, ‘অ্যালড্রিন’, ‘এলড্রিন’, ‘ডাইএলড্রিন’ সহ নানা ক্লোরিন যুক্ত কীটনাশক এবং বিষাক্ত বাইপ্রোডাক্ট। এদেরকে বলা হয় ‘পারসিস্টেন্ট অরগানিক পলিউট্যান্ট’ বা ‘পিওপি কম্পাউন্ড’। অর্থাৎ এগুলো শুধু বিষাক্ত নয়, এরা পরিবেশে অক্ষত অবস্থাতে থেকে যেতে পারে, এবং বায়ো অ্যাকুমুলেটিভ-ও হতে পারে। এর মানেই হলো খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে এরা নিম্নস্তরের উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহে প্রবেশ করে সংক্রামিত হতে পারে মানুষের শরীরে। যেমন ‘ডিডিটি’। ধরা যাক এটা ছড়ানো হলো ঘাসে, সেখান থেকে প্রবেশ করলো গবাদি পশুর শরীরে, সেখান থেকে দুধে। সেই দুধ মারফৎ মানুষের দেহে, এমনকি পরবর্তী প্রজন্মের শরীরেও প্রবেশ করল। এই ধরনের অনেক বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যকে একযোগে আবার ‘পিবিটি’ বা ‘পারসিস্টেন্ট, বায়োঅ্যাকুমুলেটিভ টক্সিক কেমিক্যাল’ শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

এছাড়াও আছে আরেকটি বিভাজন, যাদের বলা হয় ‘কারসিনোজেনিক, মিউটেজেনিক এবং টক্সিক টু রিপ্রোডাকশন’ বা ‘সিএমআর কম্পাউন্ডস’। অর্থাৎ যে সমস্ত যৌগ ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে, বা মানবশরীরে জিনের পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটাতে পারে, এবং প্রজননের জন্যে ক্ষতিকর। পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের ৰহু উপাদানের

এই দুটো ধর্মই আছে। তাই ইউরোপ এবং আমেরিকা এই সমস্ত উপাদানের উচ্চমাত্রার উৎপাদনের ক্ষেত্রে নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। উন্নত দেশগুলোতে অনেক রাসায়নিক দ্রব্য যে শুধু নিষিদ্ধ হচ্ছে, বা পিওপি, সিএমআর, পিবিটি শ্রেণীভুক্ত যৌগ গুলোর উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হচ্ছে তা নয়, শিল্প নির্গত বর্জ্যে বিষাক্ত উপাদানের পরিমাণের উপর চালু হয়েছে কড়া নজরদারী। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের মতন দেশে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ কতটা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়াও আছে ব্যবহারে ক্ষেত্রে নানা বিপর্যয়, যে ভাবে খালি হাতে, কোনওরকম নিরাপত্তা ছাড়াই এ দেশে বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য নাড়া চাড়া করা হয় তা দেখে যে কোন সচেতন মানুষ শিউরে উঠবেন। বাড়তি শ্রমিক নিরাপত্তার কথাতো বাদই দিলাম।

পরিবেশের উপর রাসায়নিক শিল্পজাত দূষণের তীব্র প্রভাব নিয়ে ধীরে ধীরে সচেতনতা বাড়ার দরুণই আজকে উন্নত দেশগুলোকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। ইউরোপে 'রিচ' নীতি চালু হবার ফলে বহুজাতিক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি নিজেদের কারখানা স্থানান্তরিত করতে উদ্যোগী হচ্ছে। 'রিচ'-এই পুরো কথাটি হলো 'রেজিস্ট্রেশন ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড অথরাইজেশন অফ কেমিক্যালস'। এই আইনের ফলে পরিবেশের সমস্ত দায়ভার নিয়ে বিশালাকার মুনাফা বজায় রাখা সম্ভব হবে না বলেই বহুজাতিক সংস্থাগুলির নতুন জায়গা খোঁজা। জার্মান কোম্পানী বি এ এস এফ-তো বলেই দিয়েছে এই আইনটি বাস্তবসম্মত নয়। এর ফলে রাসায়নিক তৈরীর খরচ যে মাত্রায় পৌঁছাবে তাতে মানুষ এর ব্যবহারই ছেড়ে দেবে। কিন্তু ইউরোপ নিজের জায়গা থেকে সরে আসেনি। যুক্তরাষ্ট্রও একইভাবে রাসায়নিক শিল্পে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করছে। কিন্তু তারা তো আর সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ছেড়ে দেবেনা। এটা অবাস্তব। অনেকক্ষেত্রেই এর ব্যবহার যেমন কাঙ্খিত নয়, বহুক্ষেত্রেই কেমিক্যাল অপরিহার্য, যথা ওষুধ শিল্প, চিকিৎসাক্ষেত্র, বস্ত্র শিল্প, নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি। কাজেই নানান রসায়নিক দ্রব্য তাদের চাই এবং চাই সমস্ত বিপদ এড়িয়ে যথা সম্ভব সস্তা মুল্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রিচ ইউরোপে অনেক রাসায়নিকদ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ নিষিদ্ধ করলেও, শেষ উৎপন্ন পণ্যটির আমদানীতে বাধা দেবেনা। কাজেই তার জন্যে আছি আমরা, তৃতীয় বিশ্বের মানুষরা - যেখানে না আছে পরিবেশের বাড়তি দায়, না আছে শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরি। এমনকি ব্যয় সংকোচের খাতিরে নিরাপত্তার ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকু এরা ঠিকমতন করেনা। ভূপাল মামলায় এটা প্রমাণিত। কাজেই কেউ বিনিয়োগ নিয়ে

আসছেন একথাটা সর্বৈব অসত্য। বিনিয়োগ তার নিজের তাগিদেই আসছে। আর এই বিনিয়োগকারীদের জামাই আদরে এদেশে অভ্যর্থনা করার জন্য হামলে পড়েছেন বাম-ডান নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত ‘জাতীয়’ নেতৃবৃন্দ ও তাদের পরিচালনাধীন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি। যেমন ‘মহারাষ্ট্র উন্নয়ন পর্ষদ’ তাদের ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলেছে : “পশ্চিমী দেশগুলোতে ‘সবুজ আন্দোলনের’ শক্তিবৃদ্ধি এবং পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ আন্দোলন ক্রমাগত তীব্রতর হওয়ার ফলে রঞ্জক দ্রব্যের বিশ্ববাজারে প্রাধান্য বিস্তার করার এক সুবর্ণ সুযোগ আজ ভারতের সামনে উপস্থিত... । অ্যালায়েড কর্পোরেশন (অধুনা অ্যালায়েড সিগনাল), আমেরিকান সায়নামাইড (এখন আমেরিকান হোম প্রোডাক্টের একটা অংশ) এবং দ্যুঁপর মতন কোম্পানীগুলো এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের রঞ্জক দ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। সস্তার শ্রম আর শিথিলতর শিল্পবর্জ্য দূষণ সংক্রান্ত আইনের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের যে বিশ্বব্যাপী প্রবণতা আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই পটভূমিতে ভারতের একটি বিশেষ ‘আপেক্ষিক সুবিধা’ রয়েছে।” ভারতের জনগণের স্বাস্থ্য জীবিকা ও পরিবেশকে ধ্বংস করে মুনাফা বৃদ্ধির যে চক্রান্ত বহুজাতিক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি আজ করে চলেছে তার অংশীদার হবার জন্যে এদেশের শাসকদলগুলি নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু করেছে। বুদ্ধবাবু তো বলেই দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের কাছে এই সুযোগ হারাতে তিনি কোনমতেই রাজী নন !

প্রথম বিশ্বে পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নানা প্রশ্নের চাপে উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে এখানে কেমিক্যাল হাব স্থাপনের পরিকল্পনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আদতে সরকারের যে নির্দিষ্ট কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনাই নেই এই প্রকল্প সেটাই প্রমাণ করে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একবারও স্পষ্ট করে জানালেন না তাঁর প্রস্তাবিত হাবে কী কী উৎপন্ন হবে? বিনিয়োগকারী কারা? তার রসায়ন ব্যবহার নীতি কী? পুরোটাই কি বিনিয়োগকারীর মর্জি নির্ভর? ভেবে শিউরে উঠতে হয় যে, তিনি শুধু নির্বিচারে এদের জমি ছেড়ে দিচ্ছেন তা নয়, এদেরকে ডেকে আনছেন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে যা দেশের সাধারণ পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। শোনা যাচ্ছে এই অঞ্চলে দেশের শ্রম আইনও প্রযুক্ত হবে না, অথচ এই ধরনের শিল্পে শ্রমিক নিরাপত্তার প্রশ্নটা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আবার যেহেতু রসায়নিক কারখানার কাজ ঝুঁকি সম্পন্ন, সেহেতু বাড়তি ভাতাও তাদের পাওয়া উচিত। অনেকক্ষেত্রেই প্রভাবটা যেহেতু সুদূরপ্রসারী,

কর্মরত শ্রমিকদের প্রতি সরকারের দীর্ঘমেয়াদী দায়বদ্ধতা থেকে যায়। সর্বোপরি এখানে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহারকারী কারা হবে - সেটাও জানা জরুরি। লক্ষ্য যদি আন্তর্জাতিক বাজার হয় তাহলে সেই সামাজিক মূল্য কেন আমরা দিতে যাবো? এ ছাড়াও আছে রাসায়নিক শিল্প থেকে নির্গত বর্জ্য সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন। প্রথম বিশ্ব যেমন কারখানাগুলোকে নির্গত বিষাক্ত বর্জ্যের পরিমাণ শুন্যে নামিয়ে আনার ফর্মান জারী করেছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের সরকারের কি নীতি হবে তা এখনও জানা যায়নি। একটা তথ্য দিলে হয়ত বর্জ্য সংক্রান্ত সমস্যাটি অনুধাবন করা সহজ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত অঞ্চলে বিপজ্জনক মাত্রায় বিষাক্ত বর্জ্য সঞ্চিত হয় সেই সমস্ত পরিত্যক্ত এলাকাকে 'সুপারফান্ড' নামে চিহ্নিত করা হয়। জানুয়ারী, ২০০২ সাল পর্যন্ত এমন উনিশটি এলাকার জন্যে দায়ি ছিল দ্যুঁপ একা। কাজেই যে সমস্ত জমি আজকে এই ভাবে নির্বিচারে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই সমস্ত অঞ্চলের ভবিষ্যত কী হতে পারে সেটা আগে জানা দরকার। স্পষ্টতই বিদেশী মূলধনে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে এমন শিল্প গড়া আত্মহত্যার সামিল।

বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আজ আসবে কাল যাবে। ইতিহাস সেই শিক্ষাই দিচ্ছে। এটা বারে বারে দেখা গেছে। দেখা গেছে আর্জেন্টিনায়, মেক্সিকোতে, দেখা গেছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এবং অন্যত্র। এতো গেল একটা দিক, অন্যদিকে আজকের রসায়ন শিল্পের অন্যতম মুখ্য প্রয়োগ ক্ষেত্র কৃষি, বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে কৃষি বাণিজ্য। বীজ, সার, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি শস্য উৎপাদনের প্রাথমিক উপকরণ থেকে চাষাবাদের ধরন, বৈচিত্র্য, এমনকি মানুষের খাদ্যাভ্যাস পর্যন্ত বদলে দিচ্ছে আজকের রসায়ন শিল্প। বাজারে কোনটা পাওয়া যাবে, কোনটা যাবেনা, কোন অঞ্চলে কি চাষ হবে, কি হবে না, তাও নির্ধারণ করছে কৃষি বাণিজ্য স্বার্থ। রাসায়নিক সংস্থাগুলিই এখন বীজ কোম্পানীগুলোকে হয় একে একে কিনে নিচ্ছে, নতুবা তাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধছে। যেমন মনসান্টো। এরা বীজ সরবরাহকারী বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থা কার্গিল এবং ডেকালব কিনে নিয়ে আন্তর্জাতিক কেমিক্যাল এবং বীজ বাণিজ্যে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করেছে। আবার সম্প্রতি ডাউ এবং মনসান্টোর মধ্যে একটি যৌথ উদ্যোগে সারা বিশ্বে বাণিজ্য করার চুক্তি হয়। উল্লেখ্য এখন 'মনসান্টো', 'ডাউ এ্যাগ্রিবিজনেস' প্রভৃতি কোম্পানীগুলি এখন বীজ তৈরী করছে গবেষণাগারে। এই ধরনের সংস্থাগুলোই জৈবপ্রযুক্তি গবেষণায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছে,

জিন প্রতিস্থাপনের কৌশল আয়ত্ত করে এমন বীজ আবিষ্কার করছে, যে একটি নির্দিষ্ট বীজের জন্যে নির্দিষ্ট কেমিক্যাল আছে, পেস্টিসাইড আছে, ইনসেক্টিসাইড আছে - সব মিলিয়ে একটা 'প্যাকেজ'। একজন কৃষক এই পুরো 'প্যাকেজ'টা ব্যবহার করতে বাধ্য। তাছাড়া বীজগুলোও হচ্ছে টারমিনেটর বীজ। অর্থাৎ উৎপাদিত ফসল থেকে যদি বীজ সংগ্রহ করে রাখা হয় তাহলে তা থেকে নতুন ফসল আর কিছুই পাওয়া যাবেনা। ফি বছর কৃষককে বীজ কিনতে হবে। অন্যদিকে ফসল বন্টন ব্যবস্থাতেও তাদের নিঃশব্দ প্রবেশ লক্ষ্যণীয়। যেমন রিলায়েন্স কৃষিবাণিজ্যে ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করতে চলেছে, তারা খুচরো কৃষি বিপনণের কারবার করবে। আবার ওরাই ডাউ কেমিক্যালের সাথেও যৌথ উদ্যোগে সামিল হতে তৎপর হয়েছে। দেশী বিদেশী শিল্প গোষ্ঠীর এই সমস্ত বাণিজ্যিক আঁতাত এবং মূলধন ও প্রযুক্তির সার্বিক একচেটিয়াকরণটা লক্ষ্যণীয়। যেমন কৃষি বিপনণে সামনে সুনীল মিত্তালের ভারতী আর পিছনে ওয়ালমার্ট। এখানে আসতে চাইছে ডাউ, ভূপাল নিয়ে তার হয়ে সওয়াল করছেন রতন টাটা। এই টাটাই কিন্তু ইন্দো-ইউ-এস সিইও ফোরামে ভারতের পক্ষে চেয়ারম্যান, যে ফোরামই কার্যত ভারতে সমস্ত মার্কিন বিনিয়োগের হর্তা কর্তা বিধাতা। এই ফোরামেরই অন্যতম সদস্য ডাউ কেমিক্যালের কর্ণধার অ্যান্ড্রু লিভেরিস। একদিকে টাটা-আম্বানী-মিত্তাল অন্যদিকে ডাউ-ওয়ালমার্ট-মনসান্টো, মুষ্ঠিমেয় কয়েকটি গোষ্ঠীর এমন বাণিজ্যিক আঁতাতের উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না। এটাই বিশ্বায়নের যুগের সার্বিক একচেটিয়াকরণ। স্পষ্টতই এই বিনিয়োগের পিছনে কাজ করছে বিশ্বায়িত পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ - ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বা ডবলিউ টি ও -এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রশক্তি। 'উন্নয়নের' নামে এই নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একদিকে সাধারণ মানুষের গলা টিপে মারার উপক্রম করছে, অন্যদিকে নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধির প্রয়াসে দেশের সমস্ত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ - জল, জমি, জঙ্গল বিদেশী বেনিয়াদের হাতে তুলে দিতে চাইছে তাদের স্থানীয় এজেন্ট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং দেশীয় শিল্প সংস্থাগুলি।

# ৫ শেষের কথা

একথা এতক্ষণে স্পষ্ট যে আপাতত বাইরে যতই শান্তির খোঁজ চলুক না কেন, ভিতর ভিতর চলছে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের প্রস্তুতি। নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব হচ্ছে না, অতএব মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন - এমনটা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে জমির খোঁজ চলছে হলদিয়া কিংবা অন্যত্রও। আপাতত রক্ষা হলেও তাই নন্দীগ্রাম, সোনাচূড়া, ভাঙাবেড়া বা খেজুরি - এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোনও কৃষিজমিই অথবা অন্য কোন জায়গার নতুন কোন জমি বা পরিবেশও আদৌ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচবে কিনা তা অনিশ্চিত। যেমন, কেমিক্যাল হাব হলদি নদীর এপারে হলো না ওপারে হলো, তাতে কিছু যায় আসেনা। যায় আসে হাব থেকে নির্গত বিষাক্ত বর্জ্য কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে যাচ্ছে, কী কী নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেখানে নেওয়া হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কোথায় সেটা ঢালা হচ্ছে, সেখানে অবশিষ্ট বিষদ্রব্য কতটা থাকছে - তাতে। অর্থাৎ কী ভাবে সামগ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ হবে, কতোটা হবে, আদৌ হবে কিনা, সেগুলো এখনো মূল প্রশ্ন। এটা তো রসায়ন শিল্প। অন্য যে কোন এখানে বিরাট পরিমাণে বিপজ্জনক নানান যৌগ তৈরী হবে, এখান থেকে নির্গত হবে অসংখ্য বিষাক্ত পদার্থ যা পরিবেশের পক্ষে, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পক্ষে, পার্শবর্তী অঞ্চলের বিরাট জনগোষ্ঠীর পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়াও থাকছে ভূপালের মতন বিরাটাকারের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। কাজেই নন্দীগ্রামে হাব হচ্ছেনা অতএব সমস্যা মিটে গেল, এলাকার মানুষ বেঁচে গেলেন, বিষয়টা মোটেই এতো সরল সাদামাটা নয়। তীব্র প্রতিরোধের জেরে বাহ্যত জমিটা আপাতত বাঁচলো ঠিকই, কিন্তু ভিতরের বিপদটা থেকেই যাচ্ছে, যেটা আরও ভয়ঙ্কর এবং সুদূরপ্রসারী। স্পষ্টতই শিল্পায়নের নামে যে কোন শর্তে যে কোনও জায়গায় এমন বিপজ্জনক শিল্প গড়ে তুলতে দেওয়া যায় না।

আমরা দেখেছি ক্যুবাটাও-এ কী হয়েছিল, দেখেছি জাপানে রাসায়নিক দূষণ কী ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছিল। এমন দৃষ্টান্তের শেষ নেই। এই যেখানে সারা বিশ্বে রসায়ন শিল্পাঞ্চলের পরিণতি, তখন পশ্চিমবঙ্গের মতন জন বহুল রাজ্যে বা ভারতবর্ষের মতন জনাকীর্ণ দেশে এই ধরনের শিল্প তালুক গড়া কতোটা ঠিক? যেখানে সরকারের জনসাধারণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কোন উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, প্রকৃত দূষণ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে এই ধরনের ঝুঁকি সম্পন্ন শিল্প স্থাপনের

পরিকল্পনা না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটাও লক্ষ্যণীয় যে এখানেও সরকার কেমিক্যাল হাবটা গড়ে তুলতে চাইছেন ব্রাজিলের ধাঁচেই। বিদেশ থেকে আসবে কাঁচা মাল, ব্যবহৃত হবে এদেশের জল, জমি আর সস্তা শ্রম। উৎপন্ন দ্রব্যগুলো এরপর আবার চলে যাবে অন্য দেশে। মূলত উন্নত দেশগুলোয়, যারা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, নিজেদের পরিবেশ রক্ষা করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সরব। আসলে প্রথম বিশ্বের পরিবেশ আন্দোলনের চাপেই উচ্চ মুনাফা বজায় রাখার জন্যে বিভিন্ন বৃহৎ বানিজ্যিক সংস্থাগুলোর তৃতীয় বিশ্বের নানান দেশে ছুটে আসা। আজকে ইউরোপের নতুন রসায়ন শিল্প নিয়ন্ত্রণ বিধি তাদের বাধ্য করছে নতুন জায়গা খুঁজতে। ওরা খুঁজুক, কিন্তু নিজেদের দেশে ওদেরকে ডেকে আনাটা হবে আত্মহত্যার সামিল। তাই এই কেমিক্যাল হাব তৈরীর পরিকল্পনা অবিলম্বে খারিজ করা উচিত। তার আগে ঠিক হোক জাতীয় রসায়ন ব্যবহার নীতি, ঠিক হোক কী কী দ্রব্য আমাদের প্রয়োজন, উন্নত হোক দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

বোঝাই যাচ্ছে যে আজকের রসায়ন শিল্প ও কৃষিনীতিও নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কী ধরনের চাষাবাদ হবে, কী ধরনের বীজ ব্যবহৃত হবে, কতটা জৈব উপাদান, কতটা রসায়নিক উপাদান ব্যবহৃত হবে বা আদৌ হবে কিনা ইত্যাদি ঠিক করে দেবে কৃষির ধরন। এর উপরই নির্ভরশীল কৃষকের লাভের ভাগ। যদি বীজ সার প্রভৃতি প্রাথমিক উপকরণ নিজের হাতে থাকে তাহলে এক, আর যদি সেটাকে কৃষকের থেকে কেড়ে নিয়ে বলা হয় কৃষি আর লাভজনক নয় সেটা আরেক। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান উপকরণের কতটা বাণিজ্যিকীকরণ হচ্ছে তার উপরই কৃষিপ্রধান দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ভর করবে। যেহেতু বর্তমান গৃহীত সরকারী নীতিতে বাণিজ্যিক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ছে, বীজে কৃষকের স্বাভাবিক অধিকার থাকছেনা, সেহেতু চাষের খরচ বাড়ছে, কৃষিতে কৃষকের লাভ কমছে। আর লাভের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক রসায়ন এবং বীজ কোম্পানীগুলোর হাতে, যে পথ প্রশস্ত করছে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগ। অন্যদিকে সরকারের অপরিকল্পিত নগরায়ণও কৃষিক্ষেত্রকে অচিরেই আরও অধিকমাত্রায় রসায়ন শিল্প নির্ভর করে তুলতে বাধ্য। শহর ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে, ফলে মানুষের সাথে ভুমির বিচ্ছিন্নতাও বেড়েই চলেছে। তা নিয়েও সরকারের কোন স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয়না। যে যেখানে জমি চাইছেন দিয়ে দিচ্ছেন, তা সেটা সিঙ্গুরই হোক বা ডানকুনিই হোক। কোথায় কী

শিল্প গড়বেন, কেন সেটা প্রয়োজন, তার সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনাতে সেই নির্দিষ্ট প্রকল্পটির ভূমিকা কী, কেন সেটা অপরিহার্য কিছুই সরকার বলছে না। সবটাই যেন বিনিয়োগকারীর মর্জি নির্ভর। তারা যা চাইবেন তাই হবে! আসলে মুখে যে যাই বলুক, বিনিয়োগ আর রপ্তানীর মাধ্যমে বিশ্বায়নের ধারায় সরকার গৃহীত উন্নয়নের ছক, কার্যত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বার্থনির্ভর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন। রাজ্যে কেমিক্যাল হাব স্থাপনের প্রচেষ্টা তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। যদি সত্যিই এর বাস্তব রূপায়ণ হয়, তাহলে আগামী দিনে একটা সামগ্রিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এদেশের যা পরিকাঠামো এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, সর্বপরি পৃথিবীতে বহুজাতিক বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর যা ইতিহাস, তা থেকে অনায়াসেই বলা যায়, যেখানেই এই শিল্পতালুক গড়ে উঠুক না কেন, তাকে ঘিরে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল অচিরেই শ্মশানে পরিণত হবে। কৃষি, খাদ্য, জল, বায়ু জনস্বাস্থ্য সবই আক্রান্ত হবে। অবস্থা বেগতিক দেখলে আজকের সমস্ত সুখের পায়রা বাণিজ্য গুটিয়ে চলে যাবে, পিছনে রেখে যাবে বিষাক্ত বধ্যভূমি। আজকে জেনে শুনে অথবা না জেনে যারা বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার অঙ্গুলি হেলনে এই শিল্পতালুক স্থাপনে উদ্যোগী হচ্ছেন, তারা দেশবাসীকে ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। শিল্পায়নের নামে উন্নয়নের যাবতীয় পথ স্থায়ী ভাবে রুদ্ধ করে দিতে চাইছেন।

আশ্চর্যের কথা এই যে, কথায় কথায় এই সরকারই আবার শিল্প বিপ্লবের গল্প শোনান। এই বিশৃঙ্খল শিল্পায়নের পথেই দুশ বছর আগে হেঁটেছিলো ইংল্যান্ড। অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেছিল লন্ডন শহর। তখনও ভূমি এবং মানুষের ভিতর ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাই কৃষিজমিকে বঞ্চিত করেছিলো তার স্বাভাবিক পুষ্টির যোগান থেকে। মাটিতে টান পড়েছিলো নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি পুষ্টিকর মৌলিক উপাদানের। উল্টোদিকে শহরে জমে উঠছিলো আবর্জনা, বিষাক্ত হচ্ছিলো টেমস নদীর জল। এরই চূড়ান্ত পরিণতি ছিলো গুয়ানো সাম্রাজ্যবাদ। প্রথমে পেরু তারপর চিলির সমুদ্র উপকূল দখলের লড়াই যার মূল লক্ষ্য ছিলো নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ গুয়ানো। অনেকেই আজকে কিন্তু ঐ পথ ছেড়ে বিকল্প কৃষিনীতি নিয়ে ভাবছেন, ভাবছেন কিভাবে উৎপাদনশীলতা বজায় রেখে অজৈব রাসায়নিক সারের নির্ভরতা কমিয়ে আনা যায়। আজকের আধুনিক নগর ও শিল্প পরিকল্পনা দুশো বছর আগের পথ নিতে পারেনা। পরিবেশ সম্পর্কে মানুষ এখন অনেক বেশী ওয়াকিবহাল, আজকের বিজ্ঞানও অনেক বেশী তথ্য সমৃদ্ধ। সভ্যতার এই অসামান্য অগ্রগতির আলোকে এখন যদি কেউ

রসায়ন শিল্প স্থাপনের কথা ভাবেন, তাকে তার সামগ্রিক পরিকল্পনায় সেই শিল্পের প্রয়োজনটা কতটা এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি কী কী, তাদের ব্যবহারনীতিটাই বা কী তা স্পষ্ট করে বলতে হবে। স্পষ্টতই বাণিজ্য স্বার্থনির্ভর একটা শিল্পনীতি এতকিছু ভাবেনা। কাজেই মুখে মনমোহন সিংহ বা বুদ্ধদেব ভট্টচার্য্যরা যাই বলুন না কেন আসলে তাঁদের নিজস্ব কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই নেই। উন্নয়নের নামে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বার্থে ভারতবর্ষের সমাজকে এঁরা কার্যত দুশো বছরের পশ্চাদপদ একটা সমাজে পিছিয়ে রাখতে চান। সরকারের গৃহীত নীতিগুলো অন্তত সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

## তথ্যসূত্র


www.panna.org

www.safe2use.com/pesticides/truelies.htm

http://www.worldbank.org/research/greening/cha5new.htm

http://www.pvcinformation.org/general/pvcHazardousProduction.php

www.michigan.gov/tittabawassee

Information Bulletin No. 4, Michigan Department of Environment

www.iptindia.org/main/ipt.php?Page=Inquiry&Report=4

www.studentsforbhopal.org

http://www.pops.int/

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

*REACHing for Chemical Safety*, Environmental Health Perspective, vol. 111, No. 14, Nov. 2003 Quality.

http://www.scorecard.org/chemical-groups/one-list.tcl?short_list_name=pop

Jean-Francois Tremblay, India's Policies thwart Chemical Industry, International, Aug 17, 1998, Vol 76, No:33.


---


প্লাটফর্ম-এর পক্ষে ড: দেবপ্রিয় মল্লিক এবং শ্রী উদয় সেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০ ১৩২ কর্তৃক মুদ্রিত।
যোগাযোগ : ৯৮৩০৩৩৫৩০৯, ৯৮৩০৫১০৯১১, ৯৮৩৬১৮৮৪১৬, অনুদান - ৩ টাকা